নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৩, পৃ : ২৭৩-২৮০
© ২০০৮ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

# বটবৃক্ষছায়া: সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, ঢাকাই সাংস্কৃতিক লালনকেন্দ্র ও কর্পোরেট উত্থান

মানস চৌধুরী*

*"খোকা গেছে মাছ ধরতে*
*ক্ষীর নদীর কূলে*
*ছিপ নিয়ে গেছে কোলাব্যাঙে*
*মাছ নিয়ে গেছে চিলে।"*
– প্রচলিত ছড়া

## 'শিল্প'রসিক সতীর্থবৃন্দ

১৯৯৫ সালে শিক্ষকতায় যোগ দেবার পর, বামপন্থী শিক্ষার্থীদের একটা রাজনৈতিক সংগঠনের পাঠচক্র পরিচালনার দায়িত্ব পাই। এবং খুশিমনে সেটা গ্রহণ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি ধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে এরকম একটা দায়িত্ব শিক্ষক হিসেবে আমার জন্য গৌরবের, এবং ক্যাম্পাসের নর্মশাসনের কথা ভাবলে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং ছিল। আমরা যখন এঙ্গেলস-এর *পরিবার, ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট্রের উদ্ভব* বইটা পড়ছি, তখন একদিনের পাঠে মেহমান করে আনার পরিকল্পনা হয় অবিসংবাদিত শ্রমিক নেতা জসিম মণ্ডলকে। উদ্দেশ্য ছিল যাতে কিতাবের বাইরে এই শ্রমিক নেতার ঘটনাবহুল জীবন ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ঋদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে এই অধ্যায়টা অত্যন্ত বিব্রতিকর একটা অনুশীলনে পর্যবসিত হয়। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী কর্মীদের বেশ কয়েকজন জসিম মণ্ডলকে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের 'শিল্প' নিয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি আলাপ করতে থাকেন শিল্প ও শিল্পায়ন নিয়ে বিপ্লবী সরকারের নীতিমালা নিয়ে। ইত্যাদি। প্রশ্নকারীরা এরপর তাঁর বিভ্রান্তি কাটানোর জন্যে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তাঁদের প্রশ্ন ছিল 'আর্ট' কিংবা 'কালচার' নিয়ে, ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে নয়। কিন্তু তাঁদের প্রয়োগে বাংলা শব্দ ধরে শ্রমিক নেতা আবারও সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পায়ন নীতিমাল এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাঁর ভাবনা বলতে শুরু করেন। ফলে অংশগ্রহণকারী প্রশ্নকর্তারা আবার ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস পান। বিষয়টা আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছিল। হতে পারে

* নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ই-মেইল: manoshchowdhury@yahoo.com

যে সঞ্চালক হিসেবে বিহ্বলতাটা দেখা না-দেয়া জরুরি ছিল। এই নিরর্থক লঘুগুরু বিবর্জিত পরিস্থিতিটা চলছিল যতক্ষণ না আমি হস্তক্ষেপ করে প্রসঙ্গের আপাতঃ নিষ্পত্তি ঘটাই।

এত বছর পর আমার পক্ষে আর নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় না যে এই ধরনের পাঠচক্র থেকে নিজেকে অবমুক্ত করে নেবার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতাটি কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু এটা আমার বিলক্ষণ মনে পড়ে যে ওইদিনের একটি সন্ধ্যা আমাকে নিমতিতা বিরক্তির মুখোমুখি করে, খোদ রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক মিত্রদের ঘিরেই এই অনুভূতিটা আমাকে আচ্ছন্ন রাখে। এবং এই একটি ঘটনা, অন্য নানাকিছু সমেত, আমাকে ৮০'র দশকের নাগরিক সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে আরেকবার খতিয়ে পর্যালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

## ৮০'র দশকের সাংস্কৃতিক প্রতিরূপ এবং প্রতিপক্ষতা

৯৫ সালে সতীর্থদের সাংস্কৃতিক যে আত্মমগ্নতা আমার বিরক্তি ও বিব্রতির কারণ ও উপলক্ষ ছিল সেটার ঠিকুজি খুঁজতে গেলে, যদি আরও পিছনে নাও যেতে চাই, ৮০'র দশকে এর স্থাপত্যকে চিহ্নিত করা সম্ভব। এভাবে দশক বিভাগে ভৌতাভৌত কোনোপ্রকার সাংস্কৃতিক প্রবণতা নির্ধারণ করাতে আমার সায় নেই। তেমনি মহানগর-মফস্বল দ্বিবিভাজনের মধ্যে সাংস্কৃতিক আকর-সারাৎসার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও আমি সবিশেষ সতর্ক থাকার পক্ষে। কিন্তু বাংলাদেশে এরশাদের শাসনামল অনেকগুলো বাহ্য প্রবণতার উছিলা সরবরাহ করেছে। লক্ষ্য রাখা দরকার, একটা সদ্য-স্বাধীন দেশের পয়লা জনবাদী, জাতীয়তাবাদীও বটে, সরকারের আকস্মিক এবং হিংসাত্মক পতনের পর সামরিক এবং ছদ্মবেশী সামরিক শক্তিগুলোর মহড়া চলছিল। দেশি-বিদেশি শক্তিকেন্দ্রগুলো জোর তৎপর ছিল নানাভাবে স্থানীয় রাজনৈতিক কাঠামোগুলোর ইচ্ছামাফিক রদবদলে। কাগজে-কলমে জিয়ার স্বলকালীন শাসনামলের প্রকৃত প্রভাব নিয়ে যথেষ্ট হিসেব-নিকেশ কষার আগেই বাস্তবে জিয়া আর নেই। ৮১-তে এরশাদের সিংহাসন লাভ এবং ৮২-তেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী খুন-খারাবির মধ্য দিয়ে নগরমনস্কতায় একটা পাবলিক প্রপঞ্চ হিসেবে 'এরশাদ' দাঁড়িয়ে গেছে।[১] 'এরশাদ' বাংলাদেশের ইতিহাসে সামরিক শাসকের একটা নাম মাত্র নয়। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রবহমানতার একটা মেটাফর বা রূপক, মোটিফ কিংবা লক্ষণা।

নগর ও মফস্বলের সাংস্কৃতিক দ্বিবিভাজন তৎকালীন বাংলাদেশকে উপলব্ধি করবার জন্য জরুরি বলে ভাবতে হয়েছে। এবং সেটা এমনকি খোদ 'এরশাদ' প্রপঞ্চটিকে বুঝবার জন্যই। এই দ্বিবিভাজন বা ডিকটমিটি কেবল সাংস্কৃতিক রূপক-লক্ষণাতে স্থিত ছিল না, বরং জীবনধারাতে[২] প্রবহমান ছিল। এই প্রক্রিয়াটা একাধারে নগরাঞ্চলের কাঙ্ক্ষিত

সাংস্কৃতিক উপাদান ও প্রেষণাকে শনাক্ত ও আত্মীকৃত করবার একটা অবলম্বন যেমন, তেমনি নিরন্তর নগর-বহির্ভূত 'অন্য'কে চিহ্নিত ও উৎপাটন করবার হাতিয়ারও বটে। নগর-প্রান্তের এই বিভাজনের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে মানদণ্ড সাপেক্ষিক, মূল্যবোধাশ্রয়ী। কী যথার্থ, কী কাঙ্ক্ষিত, কী রুচিকর, কী ঐতিহ্যবাহী, কী পরিচয়বাহী বা স্মারক – এসবের নির্দিষ্ট ভেদবিচার এই সাংস্কৃতিক দ্বিবিভাজনের প্রাণ। প্রচারমাধ্যমে এই দ্বিবিভাজন নগর-বহির্ভূতকে একটা কাল্পনিক 'গ্রামে' পর্যবসিত করে প্রকাশিত ছিল।[৩] কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দ্বিবিভাজনটির বৈপরীত্য ক্রিয়াশীল ছিল 'কাঙ্ক্ষিত শহুরেপনা' এবং 'উণ-শহুরিয়ানা'র মধ্যেই। সেই হিসেবে বৈপরীত্যটা খোদ নগর-ভাবাপন্ন সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর মধ্যকারই। ইত্যাদি।

এই বৈপরীত্যকে চলতি ভাষায় যথাক্রমে 'রুচিশীল' ও 'খ্যাত্' হিসেবে আবিষ্কার করা গেলেও এর বৈরী অনুশীলনকে অনেক পরিব্যাপ্ত পরিসরে দেখা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় এবং নগরাঞ্চলের অপরাপর সাংস্কৃতিক লালনকেন্দ্র[৪] 'অন্য' শনাক্তকরণ ও উৎপাটনের চর্চায় নিবিড়ভাবে শামিল থেকেছে। কিন্তু যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ৮০'র দশককে স্বতন্ত্র বলতে ইচ্ছুক আমি সেটা হচ্ছে গভীর বৈরিতার মধ্যেও দু'পক্ষের সাংস্কৃতিক জমিনের মধ্যে দেনদরবার বা দরকষাকষি সম্ভব ছিল। একটা সম্ভাব্য কল্পমৈত্রীও সম্ভব ছিল। সাংস্কৃতিক আকর নির্ধারণের ক্ষেত্রে শরিকি জায়গা খুঁজে পাবার প্রচেষ্টা ও উপায় দুই-ই সম্ভব ছিল। সমকালীন বাংলাদেশের মহানগর সাংস্কৃতিক মানচিত্রে সেটাই মৌলিকভাবে অসম্ভব।

### স্বৈরাচার-ডিসকোর্স এবং সাংস্কৃতিক মৈত্রী

যে দেনদরবার বা দরকষাকষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি সেটা সম্ভব ছিল মূলতঃ, যদি একমাত্র না হয়, স্বৈরাচারবিরোধী বলে যে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিমালা বিরাজিত ছিল তার পরিমণ্ডলে। এরশাদের শাসনামলকে প্রতিরোধ করা একটা অবধারিত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ইচ্ছুক-লড়িয়ে তরফে এটা যে কেবল সচেতন প্রচেষ্টা ছিল তাই নয়, বরং যে কোনো শিল্প-সংস্কৃতি সংগঠনের সম্ভাব্য সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা একটা কাঙ্ক্ষিত অনুশীলন প্রণালীর সুপারিশকারী। অন্যভাবে বললে, এরশাদ-শাসন বিরোধিতা সাংস্কৃতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতার সাধারণ সনদপত্র ছিল, বা নর্ম। 'স্বৈরাচার' কার্যত একটা ভাষামালা, একটা ভঙ্গি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছিল যা বিপরীতার্থকভাবে সাংস্কৃতিক তৎপরতার বৈধতা বা লেজিটিমিসি প্রদান করেছে। মৈত্রীর প্রসঙ্গটাও সেখানে।

জাতীয় কবিতা পরিষদ, সম্ভবতঃ, এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। উদ্যোগের ঢাকাকেন্দ্রিকতা অন্য আর পাঁচটা সাংস্কৃতিক তৎপরতার সঙ্গে মানানসই। কিন্তু এর

সাংগঠনিক বিন্যাসে এবং বহিঃপ্রকাশে ঢাকার বাইরের কবি, কাব্যরসিকদের এন্তার অংশগ্রহণ মুখ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবিতার মান ও ইত্যাদি বিষয়ে সাহিত্যবিশ্লেষকদের কারো কারো নেতিবাচক অভিমত উত্তরকালে সুস্পষ্ট পাওয়া গেছে বটে, ওই তৎপরতার আদিপর্বে এটার কোনো জিজ্ঞাসাই তৈরি হয়নি। এর রাজনৈতিক জোশ অনেকভাবেই ঠাহর করবার মতো ছিল। খোদ এরশাদকে প্রতিপক্ষ ঘোষণা কেবল নয়, বরং সাহিত্যচর্চাকারদের মধ্যকার যে অংশ রাষ্ট্রীক পৃষ্ঠপোষকতার নেটওয়ার্কে পোষ্য হিসেবে বিরাজ করছিল তার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছোঁড়াটাও এই জমায়েতের মৌলিক মেনিফেস্টো ছিল। চ্যালেঞ্জটা জোরাল। আর সেটা বোঝা সম্ভব এরশাদ ও তাঁর মিত্ররা এর প্রতিক্রিয়া করেছিলেন যেভাবে সেটার মধ্য দিয়েই। পাল্টা কবিসমাবেশ এবং কবিতার সংগঠন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এই পক্ষ দাঁড় করিয়েছিল। কবিতার প্রতি নাহক কোনো অবমাননা প্রকাশ আমার লক্ষ্য নয়, কিন্তু সতর্কভাবে এটা পাঠ করবার আছে যে একটা সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকে ঘিরে, তাও সেটা কবিতার মতো কিছু, এরকম বৈরিতার আনুষ্ঠানিকতা রাজনীতির রূপকত্বের দলিল হাজির করে মাত্র।

উদাহরণ হিসেবে জাতীয় কবিতা পরিষদ তীক্ষ্ণ বটে, তবে বছরব্যাপী তৎপরতা হিসেবে থিয়েটার সম্ভবতঃ আরও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। বহুলপরিচিত প্রসেনিয়াম মঞ্চ থিয়েটার যে এই সময়কালে এর সম্ভাবনার সর্বোচ্চ জায়গাটা বাংলাদেশে নিয়ে নিয়েছিল সেটা এখন স্বীকৃত একটা তথ্য। কিন্তু থিয়েটার তৎপরতার মুখ্য জায়গাকে চিহ্নিত করা দরকার পথ-নাটকের বিকাশমান ধারাতে, যেটাকে 'স্ট্রিট থিয়েটার' হিসেবে উল্লেখ করা হতো। বাংলাদেশে একক কোনো সাংস্কৃতিক উত্থানকে নির্দেশ করতে চাইলে পথ-নাটকই এই সময়কালের স্মারক বিশেষ। মঞ্চ থিয়েটারে ডাকসাইটে দলের রাস্তার ইউনিট কাজ করতে শুরু করেছিল। কখনো কখনো একই দলের নানান স্তরের একাধিক রাস্তার ইউনিট ছিল। অন্যদিকে, থিয়েটারে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রশিক্ষণ কিংবা নামডাক না থাকা সত্ত্বেও নানান সংগঠন রাস্তায় নাটক নিয়ে যেতে উদগ্রীব ছিল। নানানভাবে নিজেদের সামর্থ্য ও অভিব্যক্তির উপায় অনুসন্ধান করেছে দলগুলো এবং এসকল অনুশীলনে সময়কালটা বর্ণিল থেকেছে। কিন্তু প্রসঙ্গটা কেবল পরিসর হিসেবে রাস্তাকে আবিষ্কার কিংবা পরিসম্পাদনামূলক (পারফর্মিং) কলাকৌশল উদ্ভাবনের নয়, বরং এরশাদের শাসনামলকে প্রতিরোধ করা সাধারণভাবে লক্ষ্য ছিল। স্বৈরাচার ডিসকোর্স সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকে রূপদান করেছে। নগর-নগরবহির্ভূত সাংস্কৃতিক রূপ ও অনুশীলনের মধ্যকার মৈত্রীর পরিসরটাও এখানে।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে যে কিছু সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে স্বৈরাচার কিংবা এরশাদ মোকাবিলার বিষয় আসেনি। এর মধ্যে মুখ্য জায়গায় আছে ব্যান্ড সঙ্গীত। ঠিক এই সময়কালেই এই সঙ্গীতধারার উল্লম্ফন ঘটে। এর শক্তিশালী প্রভাবের

বিষয়ে পর্যবেক্ষক মহল নিঃসন্দেহ, এবং এটাও পর্যবেক্ষণযোগ্য যে মোটের উপর এরশাদ একটা প্রপঞ্চ ছিল না এই ধারার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ছিল একমাত্র দৃশ্যশ্রুতিমাধ্যম। এই মাধ্যমকে এর ভোক্তারা সেভাবে এরশাদ-বিরোধী হতে আশাও করেনি। আর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। খুব জটিল পর্যবেক্ষণ ছাড়া রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাসম্পন্ন এই মাধ্যমেও স্বৈরাচার-মোকাবিলার সামান্য উপাদান পাওয়া দুষ্কর।[৫] স্বৈরাচার-ডিসকোর্সের সঙ্গে অমিশ্রিত এই সাংস্কৃতিক ধারাগুলো এক হিসেবে প্রসঙ্গ বহির্ভূত। কিন্তু অন্যভাবে দেখলে এই ধারাগুলো অপরাপর ধারার 'ন্যায্যতা' কিংবা 'বৈধতা' কিংবা 'গ্রহণযোগ্যতা' প্রদানের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সংজ্ঞাসীমানির্ধারণের দায়িত্বহ থেকেছে।

**'কালচারাল-হাব'**

সাংস্কৃতিক মৈত্রীর পরিসর হিসেবে 'এরশাদ-বিরোধী রাজনৈতিক সচেতনতা'কে নির্দেশ করেছি আমি। এজেন্ডাসমূহের দেনদরবার বা দরকষাকষি সম্ভব ছিল রাজনৈতিক অভিলক্ষ্যের সাধারণীকৃত জমিনে। এর মানে মোটেই এই নয় যে, নগর ও মফস্বলের কথিত বিভাজনটি লুপ্ত হয়ে গেছিল, কিংবা বিলোপসাধনের কোনো প্রস্তাবনা সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ছিল। এটা বড়জোর একটা শরিকি জমিন, এজেন্ডাসমূহের পরস্পরছেদী একটা ক্ষেত্র। গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে স্বৈরাচার যেমন সনদপত্রের শক্তিতে বিরাজমান ছিল, পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আকর বিচারে গূঢ় নির্ধারকগুলো অপরিবর্তনীয় ধ্রুবক বিশেষই ছিল। সেটাই এখানে মুখ্য প্রতিপাদ্য।

সাংস্কৃতিক আকর কতগুলো মানদণ্ডকে ঘিরে আবর্তিত। বিশ্বজনীন হিসেবে বহুলখ্যাত রচনা এবং শিল্পমানসম্পন্নতার দাবিদার অন্যভাষার ও দেশের চলচ্চিত্র এই মানদণ্ডের কেন্দ্রে থেকেছে। এগুলোর পাঠাভ্যাসের ও দর্শকত্বের ঘোষণা কেন্দ্রস্থ সংস্কৃতিবান হবার মুখ্য নিয়ামক। এখানে স্পষ্ট করবার আছে যে এই লক্ষণ তৎকালীন বলার মাধ্যমে অধুনা এই মানদণ্ড বদলে গেছে বলে আমার বক্তব্য নয়। কিংবা স্বৈরাচারবিরোধী সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির উল্লিখিত মৈত্রীর মধ্যে এই মানদণ্ডগুলো ক্রিয়াশীল ছিল না সেটাও আমার বক্তব্য ছিল না। বরং যোগ্যতার মাপকাঠিগুলোর সহজ ও এজেন্ডামাফিক শৈথিল্য সম্ভব ছিল 'স্বৈরাচারবিরোধিতা'র মধ্যেই কেবল। আরও নিরীখ করে বললে, কেবল এই অভিলক্ষ্যেই মাপকাঠিগুলোর নিস্পৃহ অনুল্লেখ করা সম্ভব ছিল। এতটাই রীতিবদ্ধ এই সাংস্কৃতিক প্রবণতা। ফলতঃ, 'কালচারাল-হাব' সাংস্কৃতিক লালনকেন্দ্র বলার মাধ্যমে ভৌত পরিসরকেই কেবল আমি ইঙ্গিত করছি না, এর আকর উপাদানগুলোকেও।

বস্তুতঃ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কেন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাস বিবেচনায় খুব সাধারণ পর্যবেক্ষণেই গুরুত্ববহ। তেমনি শাহবাগ বইপাড়া, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গুরুত্বের দাবিদার। নানানভাবে এই পরিসরগুলোর পাবলিক চারিত্র্য অনুধাবন করা

সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় কিছু দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর গুরুত্ব বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবার দরকার আছে। ঢাকাই সাংস্কৃতিক সত্তা গঠনে এই কেন্দ্রগুলোর গুরুত্ব কী সেটা, আমার বিচারে, যথেষ্ট তীক্ষ্ণ সমালোচকীয়ভাবে পাঠ করা এখনো হয়নি। ঢাকা শহরে ভৌগোলিকভাবে এগুলোর অবস্থানের তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে।[৬] কিংবা বর্তমান কালের মতো উচ্চকিত নিরাপত্তাবিধান যে তখনো আবশ্যক হিসেবে দেখা হতো না সেটারও একটা প্রভাব রয়েছে বলে ঠাহর হয়। যে আকর নিয়ে এখানে আলাপ হচ্ছে এই আকরগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসব কেন্দ্রের ভূমিকা সাংস্কৃতিক ভোগসামগ্রী সরবরাহ এবং নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা থেকে স্বতন্ত্র। সেই হিসেবে এ দুয়ের পাঠের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পদ্ধতি ও অনুমান রাখার পক্ষপাতী আমি। তবে মোটের উপর ঢাকা মহানগরের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, কল্পনা এবং আত্মপরিচয়ের ব্যাকরণে এগুলোর নির্ধারণী ভূমিকা নিয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। স্থূলার্থের সম্ভাবনা সত্ত্বেও, আমার বলবার মূল জায়গা হচ্ছে স্বৈরাচার বিরোধিতা যেমন বাহ্য সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ন্যায্যতার মাপকাঠি ছিল, তেমনি সাংস্কৃতিক আত্মসত্তার নিয়ামক ছিল 'বিশ্বজনীন'/'রুচিশীল'/'শিল্পমানসম্পন্ন' সাহিত্য ও চলচ্চিত্র ভোগপ্রবণতা এবং বিদেশী দূতাবাসের অঙ্গীয় এই কেন্দ্রগুলো। এই দুই বিষয় পরস্পরবিরোধী নয়, বরং মিথোজীবী।

**সিভিল নাকি কর্পোরেট উত্থান?**

আমার বক্তব্য এই নয় যে সাংস্কৃতিক লালনকেন্দ্রগুলো আমূল বদলে গেছে, কিংবা উৎখাত হয়ে গেছে পুরাতন কেন্দ্র ও লক্ষণাসমূহ। এই রচনার প্রেষণা কল্পিত সেই বিলোপের ঘোষণা নয়, বরং নয়া লালনকেন্দ্র শনাক্ত করা। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের মহানগর সাংস্কৃতিক তৎপরতা বুঝতে ব্যক্তিমালিকানাধীন কেন্দ্রগুলোর অস্তিত্ব এবং এর প্রভাব বুঝতে পারা সমূহ জরুরি।[৭] একদিকে চলচ্চিত্রের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলো সত্বাধিকার বহির্ভূত বাজার সম্প্রসারণ করেছে; যেকোনো শপিং মলেই যাবতীয় বৈশ্বিক চলচ্চিত্রের কপি পাওয়া সম্ভব। আরেকদিকে, খোলাবাজারে, চলচ্চিত্রের তুলনায় অধিক মূল্যে বৈশ্বিক কিতাবরাজি সুলভ। এসকল প্রবণতার মধ্যে একটার পর একটা ব্যক্তিমালিকানাধীন গ্যালারি কিংবা কফির পানাগার ঢাকাই সাংস্কৃতিক প্রবণতার কেন্দ্র হয়ে উঠছে। এর দাপট বোঝা সম্ভব কেবল এগুলোর দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধিতে নয়, বরং আলাপ-আলোচনায় এগুলোর প্রতিপত্তি বিষয়ক সাফাইগানের মধ্যে। একটা পর্যবেক্ষণ এখানে হাজির করা যায়। চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের 'বিশ্বজনীনতার' সঙ্গে উত্তরকালে সঙ্গীত ও চিত্রকলার ভোগপ্রণালী উচ্চকিতভাবে যুক্ত হয়েছে। আসে যায় না সঙ্গীত ও চিত্রকলাবোদ্ধা তাতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে কিনা। এখানে প্রসঙ্গ বোদ্ধাবৃদ্ধির নয়, ঘোষণানামার।

এটাও এখানে আমার ঢালাও বক্তব্য নয় যে ৮০'র দশকের সাংস্কৃতিক লালনকেন্দ্রগুলো পাবলিক ছিল কিংবা বর্তমানগুলোর পাবলিক কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। বরং সাবেকী সেই কেন্দ্রগুলোর পাবলিক চারিত্র্য অনুমোদিত হতে হতো। সেটাই ওর সাংস্কৃতিক মেনিফেস্টোর মুখ্য দিক। বর্তমানের কেন্দ্রগুলো সাবেকী কেন্দ্রগুলোর একচ্ছত্রতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অধিকন্তু এগুলো সাংস্কৃতিক আকরের রাজনৈতিক আবিষ্টতাকে উপেক্ষা করে বিকশিত হয়েছে। স্বৈরাচারের বিরোধিতা যদি তৎকালীন সাংস্কৃতিক তৎপরতার বাহ্য মেনিফেস্টো হয়ে থাকে, জীবনশৈলীর তাগিদ তাহলে সমকালীন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার বাহ্য ঘোষণা।

অন্যত্র, বহুবছর আগেই, আমার ফয়সালা ছিল যে এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরকে একটা গণ অভ্যুত্থান হিসেবে বিবেচনা অতিকথন মাত্র। ফলে সিভিল উত্থানকে আমি একই সঙ্গে লিবেরেলিজমের একটা জোরাল পুনর্গঠন হিসেবে বিবেচনা করে এসেছি। নিবিড় পর্যবেক্ষণে উত্তরকালে একে 'কর্পোরেট'-এর যৌক্তিক বিধানকারী হিসেবেও দেখা সম্ভব। এই মুহূর্তে ঢাকার সাংস্কৃতিক লালনকেন্দ্র পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে ৯০-এর সিভিল উত্থানকে সাংস্কৃতিক স্থপতির জায়গায় দেখা জরুরি বলেই মনে হয়।

## টীকা

১. ২০০৭-এর জানুয়ারিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক চলতার বাহ্য বদল এবং আগস্টে সূচনাকৃত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিরোধ এখানে তুলনীয়ভাবে স্মর্তব্য। মিলটা, আকস্মিক হতে পারে, মনোযোগ দিয়ে পাঠের দাবিদার। বর্তমান রচনাটি মূলগতভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া নিয়ে নয়, ফলে সেই পাঠের দায়িত্ব এই রচনা নিচ্ছে না।

২. পিয়েরে ব্যুর্দোর 'lifestyle' প্রত্যয়টির বাংলা 'জীবনধারা' বা 'জীবনশৈলী' একদম খাপে-খাপ আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু আপাতত এটা দিয়ে কাজ চলতে পারে। আমার কোনো ধারণা নেই যে ফরাসি ভাষায় ব্যুর্দো একে কীভাবে বলেছেন কিংবা সেই ভাষাপ্রকল্পে এটার দ্যোতনা কী। তবে ইংরেজির সঙ্গে তুলনাটা চিত্তাকর্ষক অনুশীলন হতে পারে। ইংরেজিস্বরভঙ্গ প্রত্যয়টির জৈবগুণের তুলনায় ঐতিহ্যের দিক থেকে বাংলা মুল্লুকের 'জীবন' অনেক অধিজৈবনিক, আরও শাস্ত্রীয়ভাবে বললে মেটাফিজিক্যাল, থেকে আসছে। এটা বেশ বিস্ময়ের যে এই মুহূর্তের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনায় 'life' যেরকম সাংস্কৃতিক-অর্থময়তা সরবরাহ করতে সম্ভব, 'জীবন' তা করতে অসমর্থ। হয়তো বিভিন্ন পরিসরে ভোগপ্রণালীর রূপান্তর এবং সেসংক্রান্ত আলাপমালার ভিন্নতার মধ্যে বিষয়টাকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। সেটা অন্যত্র। যাহোক ব্যুর্দো (১৯৮৪) দেখা যেতে পারে

৩. আমার তরফে ডিকটমিটাকে 'নগর-গ্রাম' হিসেবে না-দেখানোর কারণও সেটা। একেবারেই সতর্ক অভিব্যক্তি। এটা একটা স্বতন্ত্র আলাপ প্রসঙ্গ হবে যে প্রচারমাধ্যমের (যাকে অভ্যস্ততার কারণে প্রায়শঃই গণমাধ্যম বলা হয়) জন্য 'গ্রাম' অতীব জরুরি প্রপঞ্চ, আত্মসত্তার অবিচ্ছেদ্য অত্যাবশ্যক 'অপর'; যে 'অপর'-এর জন্য কাতরতাবোধ (গূঢ়বিচারে হয়তো নস্টালজিয়া), মায়াকান্না (হয়তো ট্র্যাডিশনকে আবিষ্কারপ্রচেষ্টা) ব্যতিরেকে খোদ 'আত্ম' উদ্ভাসিত হতে পারে না। মিডিয়াস্কেপিক

বাস্তবতায় এটা অবধারিত বলে আমি মনে করি। মিডিয়াস্কেপ আর যারই প্রয়োগে থাকুক না কেন আমার জানা নেই, আমি ধারণাটা ধার করেছি আপ্পাদুরাই থেকে।

৪. দুই নম্বর টীকার মতোই এটা একটা আলাপের জায়গা হবার দাবিদার। ইংরেজিতে যখন cultural hub বলা হয় তখন আপাতগ্রাহ্যে এর তত্ত্বনিষ্টতা তেমন থাকে না। কিন্তু গভীর বিচারে ব্যুর্দোনিষ্ঠ কোনো পদ খুঁজলে habitus ধারণা দিয়ে একে পাঠ/অনুধাবন করা সম্ভব। বাংলায় সাংস্কৃতিক লালনকেন্দ্র বলে সেই ব্যঞ্জনা পেতে ইচ্ছুক আমি।

৫. কথিত এই সময়কালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রবণতা ও রূপান্তর নিয়ে আলাপ একটা স্বতন্ত্র চিত্তাকর্ষক অনুশীলন হবে। কিন্তু চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশে মোটের উপর আলাপ অতি কম। সেই বাস্তবতার সঙ্গে এটাও সবিশেষ মনোযোগ দিয়ে ভাবার বিষয় যে চলচ্চিত্রের দর্শকের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস নগরাঞ্চলের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মানচিত্র থেকে সমূহ ভিন্ন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এই সময়কালে চলচ্চিত্রে অনুপ্রবেশ করে। সেগুলোর বিশ্লেষণী তদন্ত দরকার।

৬. এখানে উল্লেখ করা যায় ফরাসি, জার্মান, ব্রিটিশ, ভারতীয় ও সোভিয়েত (উত্তরকালে রাশান) সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর কথা। স্থানবিচারেও এগুলো সবই কাছাকাছি অবস্থিত [ছিল]।

৭. সেটা বেঙ্গল গ্যালারির মতো প্রদর্শনী কেন্দ্র থেকে শুরু করে ওমনি বা কফি ওয়ার্ল্ডের মতো পাঠাগার তথা পানীয় বিক্রয় কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

৮. যদিও অনুপুঙ্খ নয়, লেখাটি একটি বক্তৃতার অনুবর্তীতে সৃষ্ট। ঢাকায় নয়া-বিকশিত ক্যাফে ও লাউঞ্জ পরিসর নিয়ে আমার বিদ্যাজাগতিক/গবেষণা-আগ্রহ বলবৎ। কজমো লাউঞ্জের কর্ণধার আরিফ হাফিজ আকস্মিকভাবে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন এবং আমি সম্মত হই। বলবার বিষয় ঠিক করেছিলাম 'লোকেশান অব এ্যান আর্টিস্ট'। এই লেখা কাঠামোগতভাবে এবং মৌলিক কিছু যুক্তির দিক থেকে সেই বক্তৃতাকে আশ্রয় করেছে। আরিফ হাফিজ এবং বক্তৃতানুষ্ঠানের শ্রোতৃকুল আমার কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

**তথ্যপঞ্জী**

Bourdieu, P 1984 *Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, MA: Harvard University Press.